Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 463 – 474
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

ভূপতি নগরের ধর্মীয় ভাবনা : স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক বিনির্মাণের আন্তঃসম্পর্ক

সঞ্জীব পাত্র
স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : patrasanjib2001@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Temple, Architecture, Folklore, Terracotta, Tradition, Culture, Mythology, Heritage, History.

Abstract
India's regional history has been reflected in its language, architecture, sculpture, painting, customs, and above all its folk culture. Bhupatinagar is a remote village in East Medinipur district on the southwest border of West Bengal. Geographically, this part of East Medinipur is close to Orissa, as a result, the region is related to Orissa in terms of language and culture. Art culture, religious thought, rituals, and folk cultures of this region are composed based on geography, climate, social structure, group tradition, people meeting, etc. The main beauty of this region is that numerous terracotta temples are situated in different places in Bhupatinagar with their class and full of verities. Based on history, archaeology, and folklore terracotta temple of this region has plentiful significance and importance. These temples were not only built for the performance of religious duties but also a significant example of the cultivation of art. Specifically, terracotta plaques fixed on temples comprise valuable elements for reconstructing the mythological and socio-cultural heritage. The themes of the terracotta plaques are mainly based on the stories of Ramayana, Mahabharata, and mythologies. At present, most of the temple's conditions are in the worst situation. Some of the famous temples are being conserved, but most of the temples are in a ruined situation. Properly and scientifically these temples must be conserved to retain the heritage of this region. Minimum written documents have been published on this subject. Mostly it has been studied description rather than an analysis of these temples. Another significant culture of this region is the worship of mundane deities. Various legends and temples have been created around these worldly deities. People not only respect but also believe in these folk culture and religious ideas that have been passed down for a long time, even before the worship of mythological gods and goddesses. Due to the spread of worship, people of high caste also offered their worship at the feet of those gods and goddesses out of fear or devotion. The hymns were written in Sanskrit. The terrestrial deities have their place in the same temple besides the mythological deities. This can be called the Aryanization of folk gods and goddesses. Mainly worshiped as village deities, most of those deities are also prevalent in other

districts of Bengal, such as Mansa, Sheetala, Sarvamangala, Vishalakshi, and Chandi. Some deities are worshiped only in these areas of Medinipur district, such as Govinda Roy, Kalurai, Shankeshwari, and Mugeshwari. In this article, our main focus to discuss is the regional antiquities (religious culture, architecture,) of Bhupatinagar and the reconstruction of temple-centric folk culture.

Discussion

বাংলার দক্ষিণ - পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম ভূপতিনগর। ভৌগলিক দিক থেকে মেদিনীপুরের এই অংশ উড়িষ্যার সন্নিকটে, ফলে ভাষা ও সংস্কৃতিগত ভাবে অঞ্চলটি উড়িষ্যার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলে। এমনকি এখনকার জনজীবন ও কথ্য ভাষায় উড়িষ্যার ছাপ স্পষ্ট। গজপতি ও গঙ্গ শাসকদের শাসনকালে এই অঞ্চল দীর্ঘদিন উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল, হয়তো সেই কারণেই সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে এখনকার আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয়ভাবনায়ও ওড়িশা সংস্কৃতির (জগন্নাথ রূপে কৃষ্ণ ও শৈব আরাধনা) প্রভাব অক্ষুন্ন। খবরের শিরোনামে কখনো নাম না উঠে আসা এই অঞ্চল মন্দির স্থাপত্যের মতো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সফল ক্ষেত্র। কিন্তু ব্যাক্তিগত মালিকাধীন হওয়ার কারণেই হোক, বা আঞ্চলিক বাসিন্দাদের প্রত্নসম্পদ ও স্থাপত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই হোক, আজ এই শতাব্দী প্রাচীন মন্দিরগুলি ধ্বংসের পথে। এমনকি বাংলার মন্দির নিয়ে লেখা গ্রন্থ্‌ বা গবেষনা পত্রেও ভূপতিনগরের মন্দির বা মন্দিরকেন্দ্রিক ধর্মীয় সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। মন্দিরের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রক্ষিতে এই পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ। এই প্রবন্ধের মূল বিষয় ভূপতিনগর থানার অন্তর্গত শতাব্দী প্রাচীন মন্দির ও ধর্মীয়স্থানগুলির স্থাপত্য শৈলী, তার দার্শনিক ভাবনা, ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। এছাড়াও বিশ্লেষণের করার চেষ্টা করবো কীভাবে ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থাপত্যসংস্কৃতির সঙ্গে এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির অভিযোজন ও বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে অঞ্চলটি নিজের এক স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলেছে।

ভূপতিনগর সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমাদের সংক্ষিপ্তভাবে এই অঞ্চলের উৎপত্তি বা এর প্রাচীন ইতিহাস জেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। মহাভারতে ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে তাম্রলিপ্ত, সুব্রহ্ম ও কলিঙ্গ নামে তিনটি রাজ্যের উল্লেখ আছে, মহারথি কর্ণ এসব অঞ্চলের শাসক ছিলেন।[১] ইতিহাস অনুসারে খ্রিস্টীয় নবম শতকে (৮২২ শকাব্দ) পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক, বালিসিতা, তুরকা, সুজামুঠা, ও কুতুবপুর - এই পাঁচটি স্থানে পাঁচজন মাহিষ্যরাজা শাসন করতেন। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে সেন রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে কলিঙ্গরাজ অনঙ্গভীমদেবের সময় দক্ষিণবঙ্গের অখন্ড মেদিনীপুর অঞ্চলে উৎকল শাসন আরও দৃঢ় হয়। অন্যদিকে রালফ্‌ ফিচ্‌ তার ভ্রমণবৃত্তান্তে অখন্ড মেদিনীপুরকে স্বাধীন হিজলী রাজ্যের অধীনে বলেছে। ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভাগ্যান্বেষী রহমত খান,উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধরের প্ররোচনায় ইখতিয়ার খাঁ উপাধি নিয়ে স্বাধীন হিজলি রাজ্যের পত্তন করে।[২] এই রাজ্য ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঈশা খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে অখন্ড মেদিনীপুর মোঘল শাসক জাহাঙ্গীরের অধীনে আসে।

হিজলির পাঠান বংশের পর বিশেষত পূর্ব মেদিনীপুর অঞ্চলটি দুটি প্রধান জমিদারিতে ভাগ হয়ে যায়। কৃষ্ণ পন্ডার নেতৃত্বে জলামুঠা, অন্যদিকে ঈশ্বরী পট্টনায়েকর নেতৃত্বে মাজনামুঠা। এবারে আমাদের মূল আলোচনা মাজনামুঠা বা অখন্ড ভগবানপুর (ভূপতিনগর থানার অন্তর্গত) অঞ্চল। ঈশ্বরী পট্টনায়েক (১৫৯৪ - ১৬১৩) কাঁথির কিশোর নগরে নিজের রাজধানী স্থাপন করে। তার পুত্র জগমোহন (১৬১৩ - ১৬৩৩) মোঘলদের থেকে চৌধুরী উপাধি লাভ করে। জগমোহনের চার পুত্র - প্রথম রানীর গর্ভে দ্বারিকানাথ ও ব্রজবল্লভ এবং দ্বিতীয় রানীর গর্ভে রায় কিশোর ও রঘুনাথ।[৩] জগমোহনের পর জমিদারি দখল করেন দ্বারিকানাথ। দ্বারিকানাথের দুই পুত্র কৃপানিধি ও কুঞ্জবিহারী। দ্বারিকানাথের (১৬৩৩ - ১৬৪৩) পর জমিদারি দখল করলেন বৈমাত্রেয় ভাই রায়কিশোর (১৬৪৩ - ১৬৯৩), যিনি কিশোরগড়ের প্রতিষ্ঠা করেন। রায়কিশোরের মৃত্যুর পর তার পুত্র ভূপতিচরণ (১৬৯৩ - ১৭৩৮) এবং তিনি অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর দৌহিত্র পার্বতীচরণ রায় (১৭৩৮ - ১৭৪৫) জমিদারি দখল করেন। অন্যদিকে কৃপানিধির একমাত্র পুত্র

যাদবরাম (১৭০০ - ১৭৮০), মুস্তাফা খাঁ নামে এক প্রভাবশালীর সমর্থনে ও আলীবর্দী খাঁর সহযোগিতায় পার্বতীচরনের মৃত্যুর পর মাজনামুঠার জমিদারি ফিরে পান। তাঁর মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যে পুত্র কুমার নারায়ন (১৭৮২) ও পৌত্র জয়নারায়নের (১৭৮৪) মৃত্যু ঘটলে বিমাতা রাণী সুগন্ধা (১৭৮৪ - ১৮০৩) জমিদারি নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেয়। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে সদর দেওয়ানি আদালতের এই জমিদারির দায়িত্ব পান যাদবরামের দৌহিত্রগণ।[৪]

ভূপতিনগর অঞ্চলের মন্দির স্থাপত্য ও মন্দিরকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে মন্দির সংস্কৃতির সম্যক ধারণা প্রয়োজন। মন্দিরের স্থাপত্য একটি শৈল্পিক বিজ্ঞান। তাত্ত্বিকজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পকার্যের সম্যক প্রয়োগ স্থাপত্যকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলে। স্থাপত্যশিল্পের সার্থকতা, স্থপতিকারের সঠিক স্থাপত্যশাস্ত্রের জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। হিউ-এন-সাঙ স্থাপত্যবিদ্যাকে ইতিহাস অনুমোদিত অন্য পাঁচটি বিজ্ঞানের একটি মনে করেন। অন্যদিকে পুরাণ মতে শুক্রাচার্য স্থাপত্যবিদ্যাকে ৬৪ কলার অংশ মনে করেন। অনেকের মতে স্থাপত্যবিদ্যা তন্ত্রসাধনার অংশ,তন্ত্র অথর্ববেদের অধীন সুতরাং এটা বলা যায় স্থাপত্যবিদ্যা অথর্ববেদের উপবেদ। বাস্তুকারেরা মনে করেন স্থাপত্যবিদ্যা একাধারে জ্যোতিষ অন্যদিকে কল্প (বেদাঙ্গ : বৈদিক নিয়ম ও প্রয়োগমূলক সূত্র)।[৫] অগ্নিপুরান অনুসারে পূর্ণ অর্জনের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। অপস্তম্ভ শ্রৌতসূত্র অনুসারে যিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি কারক বা যজন বা যজমান। অগ্নিপুরান মতে, স্থপতিকারকে সচ্চরিত্র, ধৈর্যশীল, বিনয়ী, আত্মপ্রত্যয়ী, প্রতুৎপন্নমতি, ও সর্বোপরি বাস্তুশাস্ত্রবিদ্যার তাত্ত্বিকজ্ঞান ও প্রয়োগে দক্ষ হতে হবে। ভারতে স্থাপত্যশিল্পের কাজ হরপ্পা সভ্যতার সময়কাল থেকে লক্ষ্যনীয়। বৈদিক যুগে তেমন ভাবে স্থাপত্য না গড়ে উঠলেও মৌর্য বা গুপ্ত পূর্ববর্তী যুগের স্থাপত্যের মধ্যে মূলত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রভাবিত স্তুপ, বিহার, গুহা মন্দির নির্মিত হত। গুপ্তযুগে স্থাপত্য বিজ্ঞানে প্রভূত পরিবর্তন আসে। পোড়ামাটির কারুকার্যের সঙ্গে ইটের বর্গাকার স্তম্ভশোভিত মণ্ডপ যুক্ত সর্বতোভদ্র রীতির মন্দির নির্মাণের সাংস্কৃতিক ধারা দেখা যায় এই সময়। তবে বৈচিত্র্য আর অলঙ্করণের দিক থেকে আদি মধ্যযুগেই স্থাপত্য সংস্কৃতি বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই সময় ভারতের আঞ্চলিক রাজ্যগুলির মধ্যেকার সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান অঞ্চলগুলোতে মিশ্র সংস্কৃতি ও শিল্পের জন্ম দিয়েছিল। ভারতবর্ষের মন্দির শিল্পের সর্বাধিক স্বীকৃত তিনটি ধারা - হিমালয় ও বিন্ধপর্বতের মাঝে দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের বর্গাকৃত 'নাগরশৈলী', দক্ষিণে কৃষ্ণানদী থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অঞ্চলে অষ্টকোন বিশিষ্ট 'দ্রাবিড়শৈলী' এবং বিন্ধপর্বত থেকে কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে 'বেসররীতি' (যদিও এই রীতিতে মৌলিকত্বের অভাব আছে)। ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি মতে মূলত শিখরের গঠন ভেদে শৈলী গুলির আঞ্চলিকতা প্রকাশ পায় -

'শিখরেস্য তু ভেদেন সর্বেষং ভেদ মুহিশেৎ'

খ্রিস্টীয় দশম শতকে লিখিত সমরনাঙ্গসূত্রধার-এ আমরা 'নাগর' ও 'দ্রাবিড়' শব্দ দুটি পাই। অন্যদিকে 'ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতিতে', 'বেসর' - এর জায়গায় 'বরাট' নামে এক প্রকার রীতির উল্লেখ আছে। কর্ণাটকের বেল্লারিতে নির্মিত অমৃতেশ্বর মন্দিরের লিপিগাত্রে কলিঙ্গ ও নাগর রীতিকে ভিন্ন বলা হয়েছে। যাই হোক নাগররীতি মূলত ওড়িশাকেন্দ্রিক মন্দিরগুলি অগ্রভাগে থেকে ক্রমান্বয়ে ভোগমন্ডপ, নাটমন্দির, জগমোহন বা পীড়দেউল এবং শেষে গর্ভগৃহ সমন্বিত রেখদেউল বা বিমান। বর্গাকৃতি হলেও বিমানগুলির মধ্যে ভূমিনকসা (ত্রিরথ, পঞ্চরথ, সপ্তরথ) অনুসারে পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। রেখ ও পীড় দেউল যথাক্রমে, - পিষ্ট, বাড় (পাভাগ, তলজঙ্ঘা, বন্ধন, বারান্দা), গণ্ডি (ভূমি, বিসম), মস্তক (বেঁকি, আমলক, খাপুরি, কলস, ও আয়ুধ) প্রভৃতি অংশে বিভক্ত। এই রীতির উল্লেখ্যযোগ্য মন্দির হল লিঙ্গরাজ, কোনার্ক, জগন্নাথ মন্দির প্রভৃতি।[৬] দ্রাবিড় রীতির স্বতন্ত্রতা তার মণ্ডপ সজ্জায়, অষ্টবর্গাকার ভূমিনকশার ওপর ভিত্তি করে বিমান, অর্ধমণ্ডপ, মহামণ্ডপ, স্তম্ভশোভিত অগ্রমন্ডপ, এবং গোপুরম নিয়েই দ্রাবিড় রীতি। গোপুরম সমগ্র মন্দির ক্ষেত্রের প্রবেশদ্বার। বহুক্ষেত্রে এর উচ্চতা মূল প্রসাদকে ছাড়িয়ে যায়। গোপুরম (আবেষ্টন বা আবরন) মূলত পার্শ্বদেবতাদের (কুট, কোষ্ঠ, নীড়, পঞ্জর) মন্দির। বৃহদেশ্বর, তাঞ্জাবুরের শৈব মন্দির দ্রাবিড় শিল্পরীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[৭] বেসর রীতি কোনো স্থানের দ্বারা নামাঙ্কিত নয়। শব্দটির অর্থ অশ্বতর বা খচ্চর - অর্থাৎ সংকর বা মিশ্র প্রজাতির। রুপমন্ডন অনুসারে কৃষ্ণা থেকে নর্মদা নদী পর্যন্ত অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বেসর রীতি। কলিকাগণ মতে বেসর রীতির

বিন্যাস দ্রাবিড়, কিন্তু ক্রিয়া নাগর। কর্নাটকে এবং মহীশূরে চালুক্য ও হোয়সল রাজবংশের দ্বারা নির্মিত মন্দিরগুলি এই রীতির সাক্ষর বহন করে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে মন্দিরের দার্শনিক ভিত্তি :

ভারতবর্ষ ও দর্শনশাস্ত্র দুটি প্রায় অভিন্ন শব্দ। প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ দর্শন সাধনার অন্যতম পীঠস্থান। প্রাচীন বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, থেকে শুরু করে আধুনিক কালের রাজা রামমোহন বা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতবাসীর সর্বত্র গভীর দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা বিরাজিত। স্বাভাবিক ভাবেই স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রেও সেই দার্শনিক ভাবনা বিকশিত করতে ভারতবাসী ব্যার্থ হয়নি। বিশেষত মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে শৈলীর সঙ্গে ধর্মের এক অপূর্ব সংযোগে যে তত্ত্বজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছিল, প্রাচীন থেকে আধুনিক সর্বস্তরের স্থাপত্যশিল্পে তার সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছিল ভারতীয় স্থপতিকাররা।

ভারত তথা হিন্দুধর্মের প্রেক্ষিতে মন্দিরকে সাধারণভাবে 'তীর্থক্ষেত্র' বলা হয়ে থাকে। 'তীর্থ' ও 'ক্ষেত্র' শব্দ দুটিকে পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখবো - ঋগবেদ অনুসারে 'তীর্থ' কথার অর্থ খেয়াঘাট অর্থাৎ এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে যাওয়ার পথ। ঋগবেদের দশম মণ্ডলে মানব জীবনের চার 'পুরুষার্থ' (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ)-র উল্লেখ আছে। হিন্দু ধর্ম মতে মৃত্যুর পরে নির্বাণ বা মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ ইহলোক থেকে পরলোকের পথে যাত্রা। এই পরপারের যাত্রা সাধু, ঋষি, যোগী যারা পরমজ্ঞানী, তারা মূলত পরমতত্ত্বের জ্ঞান উপলব্ধির জন্য অধ্যবসায় ও তপস্যার মধ্যদিয়ে মোক্ষ লাভ করে। আর অজ্ঞাত মানুষ মন্দিরের মতো 'তীর্থকে' ইহলোক থেকে পরলোকের অবতরণ ভূমি মনে করে। সুতরাং মন্দির সেই ক্ষেত্র যা মনু আর মননের (মানুষ ও পরমতত্ত্ব) মিলন ঘটায়। বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' বা 'বিষ্ণুধর্মত্তোর' পুরান মতে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে অরণ্যে, উদ্যানে, পাহাড়ের শীর্ষে, গুহায় বা নির্জন উপত্যকায়, যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিরাজমান। আবার মান্ডুক্য উপনিষদে বলা হয়েছে তীর্থ ও ক্ষেত্র বাইরে প্রকৃতির মধ্যে না হয়েও মানব মনের গভীরে থাকতে পারে তাই মন হল 'মানসতীর্থ'। যেখানে জ্ঞান হল সত্য, আর জল হল সত্যের প্রতীক।

বিভিন্ন স্থাপত্যশাস্ত্রে বা লিপিসমুহে আমরা মন্দিরের বিভিন্ন প্রতিশব্দ পাই – 'দেবতায়ন', 'সুরস্থান', 'আস্পদ', 'দেবধিষ্ণ্য', ইত্যাদি। এছাড়াও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে মন্দিরকে 'বিমান' এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'প্রাসাদ' নামে সম্বোধন করা হয়। বিমান অর্থাৎ বিশেষ মান যার বা বিগত মান যার। 'ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি' অনুসারে পরমতত্ব অমেয় ও অনুপম হলেও তার জাগতিক ভাষ্য মেয় বা মাপযোগ্য। জাগতিক দৃষ্টিগোচর সবকিছুর নির্দিষ্ট মান ও স্থান আছে। মন্দির যেহেতু পরমতত্ত্বের বাহ্যিক রূপ তাই এর একটি বিশেষ মান হয়। অন্যদিকে পরমতত্ব সমস্ত মাপ, মাত্রা, উপমার উর্ধ্বে, তাই তার অনুকৃতি মন্দিরও 'বিমান' অর্থাৎ বিগত মান। মিহিরকুলের 'গোয়ালিয়র প্রশস্তি' (৫৩৩ অব্দ), 'ভিলসার গরুড় স্তম্ভলিপিতে' মন্দিরকে 'প্রাসাদ' বলা হয়েছে। প্রকৃষ্ট সদ বা সদস (যজ্ঞস্থান) যার তা হলো প্রাসাদ। অন্যদিকে দেবতাদের প্রসন্ন করে বলে মন্দিরকে প্রাসাদ বলা হয়। 'ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি' অনুসারে মন্দির হলো 'নাদ' - এর প্রতীক। নাদ বিশ্বের আদি উপাদানের কারণ। ব্রহ্ম, যিনি কর্তা - কর্ম, কারন, জ্ঞানী, জ্ঞাত; তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে। তিনি পরম ঘনীভূত চেতনা, অটল,ও স্থির। শিবই ব্রহ্ম তাই শিব পরম তত্ত্ব। শিব ও শক্তি অভিন্ন, শক্তি শিবের ইচ্ছা, জ্ঞান, এবং ক্রিয়া, তাই শক্তি চলাসন (গতিশীল)। শিব - শক্তি রূপে পরা আবার জগতের প্রসবত্রী রূপে অপরা। মন্দির শিখরের সর্বোচ্চ বৃত্তাঙ্কটি বিন্দুর প্রতীক। বিন্দু হল মোক্ষের প্রতীক যা শূন্য। শূন্য রূপে শক্তি বিন্দুর আধার, গর্ভ - যেখানে বীজরূপে সৃষ্ট হয় ব্রহ্মাণ্ড। মন্দিরের ভূমিনকশা, স্থাপত্য, সবকিছুই এই পরমসত্যকে প্রদর্শিত করে।

মন্দির অঙ্গরসের দার্শনিক ভিত্তি :

প্রথমেই বলেছি মন্দির স্থাপত্যবিদ্যা এক গূঢ় আত্মিক দর্শন। স্থাপত্যের প্রতিটি অংশ এক নিখুঁত দার্শনিক মননের প্রকাশ। বেদান্ত - উপনিষদের দর্শন ও চিন্তনের (সত্ত্ব, রজ, তম গুনের প্রকাশ) প্রভাব মন্দির স্থাপত্যে দেখা যায়। মন্দিরে নিরাকার পরমতত্ত্ব হল সাকার। মন্দিরের গর্ভগৃহে পরমসত্তার উপস্থিতি, অনন্ত ব্রহ্মান্ডের গহীন তমসা থেকে

আলোকের উৎপত্তির দিক নির্দেশ করে তাই এর গুন তম:। মন্দিরের পরিধি রজ: ও শিখর সত্ত্ব গুনের পরিচায়ক। পরমসত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ভক্ত। তাই ভক্ত ও তার রসদৃষ্টি মূল স্থাপত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। মন্দিরের ভাস্কর্যগুলোর দৃষ্টি ,মুখ ভঙ্গিমা, শারীরিক সঞ্চালন ভক্তের সঙ্গে পরমসত্তার মিলন তথা গভীর রসবোধকে প্রদর্শন করে। ভারতীয় সংস্কৃতির নন্দনতত্ত্বে ভয়ানক ও বীভৎস রসের উপস্থাপনা উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে কম,সাধারণত তন্ত্রসাধনায় এর প্রয়োগ বেশি হয়। এছাড়াও স্বীকৃত রসগুলি হল- 'করুণা', 'বীর', 'অভয়', 'শান্ত', 'শৃঙ্গার', 'হাস্য', 'রৌদ্র', 'অদ্ভুত', (সমরনাঙ্গসূত্রধার)। মন্দিরের স্থাপত্য কেবল পরমতত্ত্বের পার্থিব আকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তার সার্থকতা সম্যক দর্শনেও। ভক্তের স্বাভাবিক দর্শন ও তার থেকে সৃষ্ট রসবোধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন ঘটায়। আর স্থাপত্যের মতো শৈল্পিক বিজ্ঞানে, মান, ছন্দ, অলংকার, গতিধর্ম, আমলক ও কলস এই ছয়ের সম্মিলিত গুরুত্ব অনুভবে ঘটে শিল্পের পূর্ণ রসের সৃষ্টি।

পরমতত্ত্ব বহুরূপী হয়েও এক। তার বহুরূপ বহু হয়েও একত্রিত আছে নিখুঁত মাপ, অনুপাত, সংস্থান, বিন্যাস, অনুক্রম, ও সম্বিধানে। সমরনাঙ্গসূত্রধার মতে, প্রকৃষ্ট মাপ স্থাপিত হলেই একমাত্র দেবতার আহ্বান করা যায় অর্থাৎ জগতের সম্পূর্ণতা লাভ হয়। 'বায়ুপুরান' অনুসারে ব্রহ্মের সংস্থান হল পরম প্রমাণ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট মান। 'লিঙ্গপুরান' মতে ব্রহ্ম মাটি রূপে যা প্রকাশ করে তাই দৃষ্টিগোচর, আর যা দৃষ্টিগোচর তা পরিমাপযোগ্য। 'সমরনাঙ্গসূত্রধার' অনুযায়ী ব্রহ্ম অনুৎপন্ন তাই অমেয় কিন্তু যা উৎপন্ন (অর্থাৎ মন্দির) তাই মেয়। 'নারদবাস্তুপুরুষবিধান' মতে মানবদেহের সম্বিধান ব্রহ্মান্ডের গঠন সম। জীবনের নিয়ত তত্ত্ব সুধারার অনুপাত হল প্রকৃষ্টমান বা প্রমাণ। মন্দির ব্রহ্মান্ডের অবকৃতি তাই মন্দিরের চাই সঠিক মাপ ও অনুপাত (গনিতসারসংগ্রহ)। মানের পরে আসে ছন্দ, বাস্তুশাস্ত্র মতে মন্দিরের ছন্দ হবে ব্রহ্মান্ডের ন্যায় অষ্টাক্ষরপাদ ছন্দবিশেষ অর্থাৎ অনুষ্টুপ ছন্দ। অষ্টাক্ষরপাদ দিব্যমণ্ডলের প্রতীক,যা সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ। মন্দিরের নিম্নভাগের তলছন্দ ও শিখরের ঊর্ধ্বছন্দ সবই অষ্টাক্ষরপাদ ছন্দ। তলছন্দ পরমতত্ত্বে স্থিতজগত এবং সংসারের মায়া, প্রেম, পুরুষার্থ শিখরের ঊর্ধ্বছন্দে গিয়ে একাগ্র হয়। 'ঐতেরেয় ব্রাহ্মনে' অনুষ্টুপ ছন্দের মতো ব্রহ্মান্ডের ৬৪টি পদ কল্পিত হয়েছে। তলছন্দে পার্থিব জগৎ ও উপরিছন্দে দেবালয়ের চিত্রকল্প প্রতিভাত, এইকারনে শিখরকে 'একঅগ্র' বলা হয়। ছন্দের সঙ্গে থাকে অলংকার যা মন্দিরের ভাস্কর্য, যেখানে পার্থিব জগতের যাবতীয় কার্য বা সময়ের নিত্যপ্রবাহে সংসারের পরিযানকে দেখানো হয়েছে। এছাড়াও মিথুন, ত্রিদেব, অষ্টদিকপাল, নবগ্রহ, সুরঙ্গনা, নাগ, যক্ষ, যক্ষিনী, শার্দুল, পদ্ম, দ্বারপাল, লতা, পাতা, ফুল, ইত্যাদি অলঙ্করণের জন্য ব্যবহার করা হয়। মূর্তিতে ভাস্কর্য হিসাবে মন্দিরগাত্রে বসানোর পর পৃথক পৃথক অংশ হিসাবে স্বতন্ত্র হয়েও তাদের সামগ্রিক স্থাপত্যের নিরিখে এক গতিধর্ম পালন করতে হয়। ভাস্কর্য গুলির মুখভাব, ভঙ্গি, হস্তসঞ্চালন, সম্পদস্থানক অবস্থায় দাড়ানো (সমভঙ্গ, অতিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, বক্রভঙ্গ) প্রভৃতি গতির এক দিক নির্দেশ করে। নাগর রীতিতে ব্যবহৃত আমলক বা দ্রাবিড় রীতির পেয়ালার মত গম্বুজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতার সিদ্ধি। আমলক মন্দিরের ভারসাম্য বজায় রাখে, স্তপিকার বেদী রূপে কাজ করে, সর্বোপরি শিখরের শীর্ষ বিন্দু ও গর্ভগৃহের ব্রহ্মস্থানের মধ্যে যোগসাধন করে। স্তপিকার অংশ কলস, দেবতার কলা অংশের মিশ্রণ তাই এটা মহানির্বাণযন্ত্র। ময়মত অনুসারে সোনা কলসের শ্রেষ্ঠতম উপাদান, তবে রূপা, তামা, পাথর, ইট, কাদা বিকল্পরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভূপতিনগরের মন্দির স্থাপত্য ও ধর্মবিশ্বাস :

আমাদের মূল আলোচ্য ভূপতিনগর এলাকা কোনো বিচ্ছিন্ন জনপদ নয় বরং পশ্চিমবাংলার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই অঞ্চলের শিল্প - সংস্কৃতি, ধর্মভাবনা, আচার-পার্বণ, লোক - সংস্কৃতি প্রভৃতি এখানকার ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, শ্রমভিত্তিক, সমাজ কাঠামো, গোষ্ঠী ঐতিহ্য, জনমিলন, প্রভৃতির ভিত্তিতে রচিত হয়। আমাদের মূল বিষয় ভূপতিনগরের আঞ্চলিক পুরাকীর্তি (মন্দির সংস্কৃতি) এবং মন্দির কেন্দ্রিক ভারতীয় দর্শন ও লোকসংস্কৃতির বিনির্মাণ। ভৌগলিক কারণে মেদিনীপুরের এই অঞ্চল আরও ব্যাপক সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটেছে, কারণ এই অঞ্চল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের স্বাভাবিক চলন পথ। সপ্তম শতকে গৌড়রাজ শশাঙ্কের বদ্যানতায় সমগ্র গৌড় জুড়ে শৈব্য আরাধনার শুরু হয়। কিন্তু দ্বাদশ

শতকের বাংলায় বৈষ্ণব সেন রাজাদের আমলে দক্ষিণবঙ্গের অঞ্চলগুলিতে চতুর্ভুজ নারায়ন মূর্তি ও শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণু উপাসনার আবেগ বাড়তে থাকে। ঠিক এর পরেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পুরী যাত্রাকালে (১৫১০) হলদী - কেলেঘাই নদীপথে পটাশপুরের প্রয়াগঘাট বা পাথরঘাটায় এবং পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় (১৫১৪) চন্ডিপুরের পিছলদায় পদার্পন করেন। চৈতন্য পার্ষদ ও পদকর্তা বাসুদেব ঘোষের তমলুকে মহাপ্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠা, ষোড়শ শতকে শ্যামনন্দপ্রভু ও রসিকানন্দ গোস্বামীর ভগবানপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার এই অঞ্চলে ব্যাপক বিষ্ণু বা কৃষ্ণ আরাধনার সূত্রপাত ঘটায়। তবে অখন্ড ভগবানপুর তথা ভূপতিনগর এলাকায় বৈষ্ণব ধর্মভাবনার বিস্তার সর্বাধিক মাত্রায় দেখা দেয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে। কলিঙ্গ শাসক প্রতাপরুদ্রদেবের মৃত্যুর পর (১৫৪০) সেখানকার অস্থিরতায় দিনে রাজা, আমাত্য ও ভাগ্যান্বেষীরা মেদিনীপুরের এইসব স্থানে এসে বসবাস শুরু করে। পরে জমিদার যাদবরামের আমন্ত্রণে ওড়িশা থেকে নন্দ, ত্রিপাঠী, ষড়ঙ্গীরা, এই সব অঞ্চলে বসবাস শুরু করলে বৈষ্ণব আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মন্যতন্ত্র ও পৌরাণিক দেবদেবীর প্রভুত্বের প্রতিক্রিয়ায় প্রাচীন কোমধারার দেবদেবী, বিশেষত শক্তি পূজার পুনরুত্থান ঘটে। ভূপতিনগর জনপদে মাতৃশক্তির আরাধনায় কালী ছাড়া বনদেবী, বাসুলী, চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, শীতলা, উগ্রচণ্ডী, প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হয়।[৮] এ সময় এই সব লোকদেবীর মহাত্ম্য বর্ণনায় মঙ্গলগান বিশেষ ভূমিকা নিত। পশ্চিমবাংলার প্রেক্ষিতে ভূপতিনগর জনপদের মন্দির সংস্কৃতির বিশ্লেষনে দেখবো বাংলার অন্যান্য মন্দির স্থাপত্যের রীতি অনুসারে, এই অঞ্চলের মন্দিরও প্রায় চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত - চালা, রত্ন, দেউল, চাঁদনী - দালান। ভূপতিনগর জনপদের প্রতিটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সঙ্গে এক ধরনের বিশেষ লোকবিশ্বাস ও সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে যা আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করবো।

আমাদের আলোচনার প্রথম অংশ ভূপতিনগর থানার অন্তর্গত শ্রেষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অর্জুননগরের মদনগোপাল জিউর মন্দির। কথিত আছে মাজনামুঠা জমিদারির কিশোরপুর রাজপরিবারের রাজা যাদবরাম মদনগোপাল জিউর বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং পরবর্তীকালে ওই বংশের, রাণী সুগন্ধা (১৭৮৩-১৮০৩) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরটির নির্মাণ নিয়ে সমকালীন কবি রামহরি দাসের এক দীর্ঘ কবিতা পাওয়া যায় -

"এই নামে অবতার লইয়া ক্ষিতির ভার
বাস করে নাড়ুয়া ভিতর,
যাদবরাম ভূমিস্বামী কি বন্দিব শিশু আমি
সাকিনেতে অর্জুননগর।
যাদবরামের কুলবধূ কুলের কলিকাবিন্দু
কুমার নারায়ণ যার পতি,
সেই নারী ভাবি মনে সদা চিত্তে নারায়ণে
হবেন প্রভু আমার সারথি।
সুগন্ধা নামেতে রানী পতিব্রতা সুলোচনী
খ্যাতি যাঁর পুণ্য এ জগতে,
ভূপতির পাটেশ্বরী অপুত্রক সেই নারী
গোবিন্দ স্মরণ লেই চিতে।"

অর্জুননগরের দেউলটি ওড়িশার নাগর রীতির সপ্তরথ ভূমিনকশার পরিকল্পনায় তৈরি। গর্ভগৃহে সমন্বিত রেখ দেউল পূর্বমুখী, যদিও জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ অনুপস্থিত। সম্মুখভাগে চাঁদনী রীতির সমতল ছাদ যুক্ত নাটমন্দির মূল মন্দির থেকে পৃথক অবস্থানে দাঁড়িয়ে। সংস্কার কালে ওড়িশার নাগর রীতির সঙ্গে বাংলার চাঁদনী রীতির এক দর্শনীয় সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটেছে এই দেউল মন্দিরে। দেউলটির উচ্চতা ৬৫ ফুট, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৯ ফুট ৯ ইঞ্চি। একদুয়ার বিশিষ্ট মন্দিরটির প্রবেশপথের উচ্চতা ৫ ফুট। গর্ভগৃহের ভিতরের ছাদ চারটি খিলানের ওপর চারকোনা যুক্ত ভল্টে গঠিত। গর্ভগৃহের ভিতরের আয়তন ১২ ফুট × ১১ ফুট ১০ ইঞ্চি, বিগ্রহ বেদীর মাপ ৫ ফুট×৮ ফুট ১০ ইঞ্চি। মন্দিরটি কাঠের

পোড়ানো ইটের তৈরি। বর্তমানে মূল রেখ দেউলটি পশ্চিম দিকে ৫ - ৮ ডিগ্রি হেলে গেছে (সম্ভবত মাটি বসে যাওয়ার কারণে)। অর্জুননগরের সপ্তরথ দেউলটি গণ্ডির অংশ শাস্ত্রসম্মত ভাবে খাঁজকাটা নয় (যদিও পিষ্ঠে সপ্তরথ নকশা সঠিক ব্যবহার হয়েছে ,উপরের গণ্ডি অংশের পরিবর্তন সম্ভবত সংস্কার কালে করা হয়েছে)। মূল চারটি কোন বাদে প্রতিটি পার্শ্বে পাঁচটি করে তল তৈরি হয়েছে অর্থাৎ দর্শনার্থী একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক পার্শ্বে সাতটি তল দেখতে পাবে। মাঝখানে তলটি 'রাহাপাগ', দুটি কোনায় 'কোনাপাগ', 'কোনাপাগ' ও 'রাহাপাগের' মাঝে অপেক্ষাকৃত বড়ো তলদুটি 'অনুরথপাগ' এবং ছোটো আরও দুটি তলের সৃষ্টি হয়েছে সপ্তরথ ভূমি নকশার ফলে। গণ্ডির পর মস্তক অংশের সর্বনিম্ন ভাগ বেঁকি আমলকের তুলনায় অনেক বড়ো যেখানে আমলক নাগর রীতির চিরাচরিত ঐতিহ্য ভেঙে অপেক্ষাকৃত ছোটো হয়ে পদ্মের রূপ নিয়েছে। বেঁকি অংশে অনেক ধরনের নকশা আঁকা যা নাগর রীতিতে বেশি দেখা যায় না, আমলকের সঙ্গে খাপুরির মিলন স্থল ত্রিপথধারাকে অযথা বড়ো করা হয়েছে। (সম্ভবত সংস্কারকালে নাগররীতির সঙ্গে বাংলার প্রাচীন তুলসীমঞ্চের গঠনশৈলীকে একত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই দেউলে। যেখানে পরমতত্ত্বের রূপ গর্ভগৃহে কল্পনা না করে মন্দিরের চূড়ায় পদ্মের ওপর তুলসী মঞ্চের অধিস্থানে কল্পনা করা হয়েছে, এমনকি দেব অস্ত্র বা আয়ুধ যা নাগর রীতির মন্দিরের চূড়ায় থাকা বাঞ্ছনীয় তা অর্জুননগরের দেউল অনুপস্থিত। অর্থাৎ তুলসী মঞ্চের মতো মন্দিরের ওপর দেবঅস্ত্রের পরিবর্তে তুলসী গাছের অবস্থান এই মন্দিরের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ইঙ্গিত বহন করে)। খাপুরির ওপর কলসি,- যার কলসি পাদ, কলসি হাঁড়ি, ও কলসি গাড়ি (গলা) খুব স্পষ্ট। কলসির ওপর বিষ্ণুমন্দির হিসাবে চক্র থাকা উচিত ছিল কিন্তু তা অনুপস্থিত আগেই বলেছি। বিংশ শতকের মধ্যভাগে মন্দিরের জীর্ণ অবস্থাকালে মূল বিগ্রহকে ছোটো উদয়পুরের (পটাশপুর) সেবাইত কর পরিবারে স্থানান্তর করা হয়েছিল। বর্তমানে বিগ্রহটি পুনরায় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। রাস ও দোলের সময় মন্দিরকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ উৎসব ও মেলা সংগঠিত হয়।

ভূপতিনগর জনপদের সর্বোচ্চ মন্দির ও শ্রেষ্ট পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হল জুখিয়ার নবরত্ন মন্দির। জুখিয়া নামটি নদী স্মৃতিবাহী। লোকমুখে প্রচারিত যে জোড় খেয়া থেকেই জুখিয়া নামটি এসেছে। 'মেদিনীপুরের গ্রাম কথা – ৪' বইতে জুখিয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক জগন্নাথ দাস লিখেছেন - এই অঞ্চল মজে যাওয়া কালিন্দী নদীর তীরের একটি গ্রাম। জোড়া খেয়া পারাপার হয়ে এই গ্রামের হাটে আসতে হয় বলেই এই নামকরণ (আধুনিক কালে পুকুর সংস্কারের সময় পুরোনো খেয়া ঘাটের চিহ্ন পাওয়া গেছে)। মন্দির সংস্কার কালে মন্দির গাত্রে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্কারলিপি দেখে অনেকের অনুমান যে এই নবরত্ন মন্দির গড়বাসুদেবপুরের জলামুঠা জমিদারির কোনো এক পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এই তথ্য যথার্থ নয়। উক্ত লিপিটি হল –

"এই নবরত্ন মন্দীর বহু পুরাকালে সর্গীয়
মহারাজা কতৃক প্রস্তুৎ হইয়াছিল বহু
দিনান্তে মন্দিরের অবস্তা অতিশয় খারাপ
হয়ায় তাহা প্রশংসীত শ্রীল শ্রীমতি রানি
হরিপ্রিয়া দেবী জমিদার স্টেট জলা
নূতন গঠন হইয়া মেরামত কার্য্যাদি সমা
ধা করাইয়াছেন উক্ত কার্য্য সন ১২৯৮ সাল
হইতে সন ১৩০৮ সাল প্রজন্তে শেষ হইল
মেনাজার শ্রীযুক্তবাবু নন্দলাল রায়
মিস্ত্রী শ্রী লক্ষ্মীনারান গিরি।"

প্রবোধচন্দ্র সেন তার 'ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে' এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বা যাজক হিসাবে জুখিয়ার হৃদয়রাম বেরার নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন বাসুদেবপুরের জলামুঠা বংশের উত্তরসূরি দুর্গাদাস রায় তাঁকে জানান এই মন্দির সহ ছ'বুড়ি দেউল এবং ন'বুড়ি পুকুরের প্রতিষ্ঠা করে হৃদয়রাম বেরা, তাদের পূর্বপুরুষরা এর সংস্কার করেছে মাত্র।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 463-474
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যাইহোক নবরত্ন নামটি থেকে এটা স্পষ্ট যে মন্দিরটি বাংলার রত্নশৈলী রীতি মেনেই তৈরি। প্রশস্ত আয়তনের উচ্চবেদীর ওপর পূর্বমুখী ত্রিতল বিশিষ্ট মন্দির খুবই দৃষ্টিনন্দন। মন্দিরটি সামগ্রিক উচ্চতা প্রায় ৭৫ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৩১ ফুট ৭ ইঞ্চি। সামনে ত্রিখিলান প্রবেশ পথ যুক্ত অলিন্দ। গর্ভগৃহের ভেতরের ছাদ পীড়া পদ্ধতিতে খিলান ও ভলটে গঠিত। গর্ভগৃহের দক্ষিণ দিকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ। প্রায় ৩৮টি সিঁড়ি অতিক্রম করে দ্বিতলে এবং তারপর প্রায় ২১টি সিঁড়ির পর ত্রিতল (মোট ৫৯)। দ্বিতল থেকে ত্রিতলে যাওয়ার সিঁড়ি অনেকটাই বেশি খাড়া। গর্ভগৃহের অন্য তিনদিকেও প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। দুই দিকে আচ্ছাদন সহ ঢালু চাঁদনী রীতিতে প্রথম তলটি সম্পূর্ণ। এর ওপর ঠিক চারটি কোণে - ঈশান, বায়ু, নৈঋত, অগ্নি - চারটি করে রত্ন, আর মধ্যস্থলে একটি পঞ্চরত্ন কক্ষ (সম্ভবত দ্রাবিড় রীতির মতো প্রত্যেকটি রত্ন পার্শ্বদেবতার অবস্থানের পরিকল্পনায় তৈরি)। মন্দিরের প্রথম ও দ্বিতীয় তল (নিম্নাঙ্গ) ও ত্রিতলের (উর্ধ্বাঙ্গ) মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য স্পষ্ট। ত্রিতল নিম্নাঙ্গের তুলনায় অধিক উঁচু, তাই দর্শনার্থী প্রথম দর্শনে উর্ধ্বাঙ্গের মধ্যে পরমতত্ত্বের অধিষ্ঠান কল্পনা করে নেয় তাই মন্দিরের ক্ষেত্রে ত্রিতল অধিক গুরত্বপূর্ণ। পার্শ্বরত্ন সবগুলি শিখর রীতির ত্রিরথ নকশায় খাঁজকাটা, কেবলমাত্র ত্রিতলের পঞ্চরত্নের সবচেয়ে বড় রত্নটি পঞ্চরথ নকশায় খাঁজকাটা। রত্নগুলি গণ্ডি অংশ শাস্ত্রসম্মত ভাবে শিখর রীতি মেনে চলেনি। প্রত্যেকটি রত্নের চূড়ায় তিনটি করে কলস থাকলেও দেবাস্ত্র বা আয়ুধ অনুপস্থিত। গর্ভগৃহের মূল প্রবেশদ্বারে প্রকৃত খিলান বা আর্চের ব্যবহার আছে (প্রথমে প্রতিষ্ঠাকালে কার্বেলিঙ পদ্ধতির খিলান তৈরি করা হয়েছিল। পরে সংস্কারকালে প্রকৃত খিলানে ভিসৌর রীতি প্রয়োগ করা হয়েছে)। পোড়াইটের তৈরি মন্দিরে অলংকরণ খুবই সামান্য। প্রবেশপথের একদম উপরে আছে বিষ্ণুর দশবতার মূর্তি। প্রধান প্রবেশদ্বারের ওপর হর পার্বতীর বিবাহ এবং ডান - বাম পাশে যথাক্রমে জগৎপিতা ব্রহ্মা ও জগৎপালক বিষ্ণুর মূর্তি করা। এছাড়াও অলংকরণে পৌরাণিক আখ্যানগুলি প্রতিভাত। রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, রাম - রাবণের যুদ্ধ, রাবণের সীতাহরণ, হনুমান, অশোকবনে সীতা, বকাসুর বধ, ইত্যাদি কাহিনী চিত্রের দৃশ্য ফলক অসাধারণভাবে ফুটে উঠেছে। তবে এই সবই সংস্কার সময়ে স্থাপতি বলেই মনে হয়। মন্দিরটির সেবার জন্য সুবৃহৎ ভূমি থাকলেও তা বর্তমানে ব্যক্তিগত দখলাকৃত। বৈশাখে চন্দনী দীঘিতে ঠাকুরের চন্দনযাত্রা ও চন্দনী মেলা, ভাদ্রে ঝুলনযাত্রা এবং কার্তিকে রাসযাত্রা। আগে মাঘ মাসে হত ঠাকুরের মাঘী রথযাত্রা। বর্তমানে মন্দিরটি অবহেলায় ও সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংসের পথে।

জুখিয়ার রাধাগোবিন্দ জীউর নবরত্ন মন্দিরের দক্ষিণ পাশে কয়েক হাত ব্যবধানে এখনও দাঁড়িয়ে আছে পূর্বমুখী ধেলুয়ার কালী মন্দির। এর দৈর্ঘ্য - প্রস্থ ১৮ ফুট × ১৭ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট। সম্মুখে ত্রিখিলান গোল থাম যুক্ত প্রবেশ পথ ও অলিন্দ (দৈর্ঘ্য ৭ ফুট)। অলিন্দের ছাদ খিলানে তৈরি এবং গর্ভগৃহের ছাদ দুটি খিলানের উপর ভলটে গঠিত। মন্দিরটিকে বাংলার চিরাচরিত চালা স্থাপত্য রীতির আটচালা শৈলীর আদলে তৈরি। অন্যদিকে ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন এটিকে মুসলিম স্থাপত্য রীতির গম্বুজ যুক্ত বিরল হিন্দু মন্দিরের শ্রেণিভুক্ত করে রায়গঞ্জের (পশ্চিম দিনাজপুর) বিন্দোল ভৈরবী মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রকৃত পক্ষে নিম্নাঙ্গের চার চালা স্থাপত্যশাস্ত্রের নিয়ম মেনে তৈরি হলেও ঊর্ধ্বাঙ্গের চার চালা বাংলার স্থাপত্য রীতি ভঙ্গ করে কিছুটা গম্বুজের রূপ নিয়েছে। মন্দিরটি পোড়ামাটির ইটের তৈরি। প্রবেশ পথের খিলানে প্রথমে কার্বেলিঙ ও পরে ভিসৌর রীতির প্রয়োগ ঘটেছে। মন্দিরে কোনো ধরনের অলংকরণ নেই। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জনশ্রুতি মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর হৃদয়রাম বেরা। মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত এবং ধ্বংসের পথে। বিগ্রহ (মুণ্ডমালা শোভিত দশভূজা কালি এবং চতুর্ভুজা উগ্রচন্ডা) পূজিত হন নবরত্ন মন্দিরে। আশ্বিনের নবমীতে বিগ্রহকে কেন্দ্র করে দুর্গাপূজা হয়।

আলোচ্য জনপদের চতুর্থ মন্দির হল বায়েন্দার শিব মন্দির। প্রথমেই জেনে নেই 'বায়েন্দা' অঞ্চল সৃষ্টির ইতিহাস। বায়েন্দার পূর্বনাম ছিল 'বানজা'। ভ্যালেনটিনের স্মারকস্মৃতি অনুসারে এই অঞ্চল ছিল পর্তুগিজ কলোনী, লবণ ব্যবসার কেন্দ্র। পর্তুগিজরা হিজলী রাজ্যে দুটি গির্জা নির্মাণ করে, একটি হিজলী শহরে, অন্যটি বানজায়। বাংলা অভিধানে বাঁজা কথার অর্থ বন্ধ্যা এবং মোঘল আমলে অনুর্বর জমিকে বানজার বলা হত। যেহেতু বায়েন্দা অঞ্চলটি সমুদ্রগর্ভ থেকে সৃষ্ট, (পলি সঞ্চয়ের ফলে) তাই প্রথম দিকে ভূমি অনুর্বর থাকায় স্থানীয়রা সম্ভবত অঞ্চলটিকে 'বানজার' বলে

ডাকতো। বর্তমান 'বায়েন্দা' শব্দটি ইংরাজীতে Bayenda লেখা হয়, আর বানজা ইংরেজী উচ্চারণ করলে হয় Bayenja। পরবর্তীকালে Bayenja শব্দটি Bayenda রূপে উচ্চারিত হয়েছে।[৮] বায়েন্দায় বর্তমানকালে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এই অঞ্চলের বন্দর হওয়ার অনুমানকে দৃঢ় করে। অন্যমতে পর্তুগীজরা বন্দরকে ব্যান্ডেলও বলতো, সেইসূত্রে ব্যান্ডেল থেকে বায়েন্দা নামটি আসা স্বাভাবিক। সম্ভবত ভুআলোড়নজনিত কারণে নদীখাত পথ পরিবর্তন করে এবং প্রাচীন প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য বড় বড় ঘেরি বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক গতি রোধ হয়।

যাই হোক বায়েন্দার বড় পুকুর সংস্কারকালে প্রাপ্ত চড়ক গাছ ও কলভৈরবের মূর্তি এবং প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে এই এলকা প্রাচীন শৈবতীর্থ ছিল। বৃদ্ধ সেবাইত খগেন ত্রিপাঠী দেবতার স্বপ্নাদেশ ও জঙ্গলভূমিতে গোমাতার অলৌকিক দুগ্ধক্ষরণের পরিচিত লোককথা উল্লেখ করে বলেছিলেন শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠার কাহিনী এর যাজক বা ভূমিদাতার পরিচয় সবই তাদের অজানা। ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুচিরাম গায়েন জঙ্গল কাটিয়ে পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর বর্তমান পঞ্চরথ দেউলটি নির্মাণ করেন। অনেকে মনে করেন বায়েন্দা অঞ্চলটি পূর্বে গড় বাসুদেবপুরের জলামুঠা জমিদারির অধীনে। এই মন্দির ও পুকুর সহ প্রায় ৩১ ডেসিমেল ভূমি ওই রাজপরিবারের দান। পূর্বমুখী মন্দিরটি উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। আড়াই ফুট উঁচু ২০ ফুট প্রশস্ত বর্গাকার বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটির নিম্নাঙ্গ বর্গাকার পীড় দেউল বা জগমোহনের মতো। নাগরশৈলীর মিশ্র রীতিতে তৈরী মন্দিরটির ঊর্ধ্বাঙ্গ পঞ্চরথ শিখরের মতো দৃশ্যমান হলেও তা কিছুটা গম্বুজাকৃতি (শাস্ত্রসম্মত শিখর নয়)। মস্তক অংশে আবার ভদ্র বা পীড় দেউলের রীতি গ্রহণ করা হয়েছে, (স্থপতিকারদের নতুন কিছু সৃষ্টির প্রচেষ্টা বা নাগরশৈলী সম্পর্কে সল্প জ্ঞানের জন্য হয়তো এমন মিশ্র রীতির প্রয়োগ হয়েছে মন্দিরটিতে)। মস্তক অংশে আমলকটি অনেক ছোটো। কারণ আমলকের নিচে এবং বেঁকির উপরে যুক্ত হয়েছে একটি নূতন অলঙ্কার—ঘণ্টা বা শ্রী। ওই ঘণ্টার আবার নিজস্ব খাপুরি আছে, ত্রিপথধারার পরিবর্তে এসেছে 'সিঙ্গুপত্র-পাখুড়' এবং ঘণ্টার জন্য দ্বিতীয় একটি বেঁকি এসেছে, যার নাম আমল - বেঁকি। কলস ও আয়ুধ অংশে চক্রপতকাত্রিশূলের অবস্থান। মন্দির গাত্রে কোনো ধরনের অলংকরণ নেই। শিবরাত্রির দিনে মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয় মন্দির প্রাঙ্গণে। পূর্বে চড়ক উৎসব হতো, একসময় এক ভক্তার ডুবে মরার ঘটনায় উৎসবে ছেদ পড়ে।[৯]

ভূপতিনগর অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবী ও লোকসংস্কৃতি :

ভূপতিনগর অঞ্চলের পঞ্চম বিখ্যাত মন্দিরটি হল মুগবেড়িয়ার 'মুগেশ্বরী মন্দির'। স্বাভাবিক ভাবেই উপলব্ধি করা যায় দেবী মুগেশ্বরীকে কেন্দ্র করেই মুগবেড়িয়ার নামের মাহাত্ম্য। তবে মুগবেড়িয়া শব্দের উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক আছে। মুগেশ্বরী শব্দটির মূলরূপ মৃগেশ্বরী অর্থাৎ বনদেবী (মৃগ শব্দের অর্থ হরিণ, কিন্তু মৃগ শব্দের আদি অর্থ ছিল যে কোন পশু)। মুগবেড়িয়া শব্দের মূলরূপ মৃগবাটিকা অর্থাৎ মৃগেশ্বরীর কুটির ('ঋ' ধ্বনি উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতে 'রু' ধবনির মত উচ্চারিত হয়, তাই মৃগেশ্বরী > ম্রুগেশ্বরী > মুগেশ্বরী— এই ধারায় ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে)। অন্যদিকে বেড়িয়া-র একাধিক অর্থ লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত শব্দ 'বর্ধ' থেকে বাড়, যার অর্থ বর্ধিত অংশ। কোলীয় (সাঁওতালি - মুণ্ডারি) ভাষায় বাড়, উঁচু আল ঘেরা জমিকে বোঝাতো (সেই অর্থে এই অঞ্চল নদীর পলি জমে সৃষ্টি হয়েছিল যার চারিদিকে ছিল নিম্ন জলাভূমি)। এই অঞ্চলে লোকমুখে গ্রামের মোড়ল অর্থে 'বাড়ুয়া' শব্দের ব্যবহার করা হয়, সেই প্রেক্ষিতে বাড় অর্থ গ্রাম।[১০] অধ্যাপক সন্তোষ কুমার পড়িয়া জানিয়েছেন, বনাঞ্চল পরিষ্কার করার সময় এলাকার মানুষ এক কৃষ্ণবর্ণ শিলাখন্ড দেখতে পায় এবং তাকেই দেবীরূপে মর্যাদা দেয়। সম্ভবত যে অঞ্চল পরিষ্কার করা হয়েছিল সেই অঞ্চলে মুগকলাইয়ের চাষ হত। সোনামুগ ও কালি মুগের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের মাষকলাইয়ের (আঞ্চলিক নাম বিরি) চাষ বেশি হতো এই অঞ্চলে। লোকভাষায় শাক সব্বজি চাষের ধোসাকে বলা হয় বাড়ি। তাই মুগ ফসলের ক্ষেতকে কথ্য ভাষায় লোকে বলতো বাড়ি (বেড়েলা- আভিধানিক অর্থ বিশেষ প্রকারের ঝোপ)। আর এই মুগবাড়িতে আবির্ভূত শিলা 'মুগেশ্বরী' নাম পায়। আবির্ভাব স্থান মুগবাড়িকে ক্ষেত্র অর্থে মুগবেড়িয়া আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অঞ্চলের অনেক স্থান নাম বাড়িয়া থেকে বেড়িয়া হয়েছে (যেমন- ইটাবাড়িয়া, বাসুদেববাড়িয়া, পাথরবাড়িয়া, কলাবাড়িয়া ইত্যাদি নামের উচ্চারণের বা > বে হয়েছে)। এই ধরনের ভাষার উচ্চারনে পরিবর্তনগত প্রবণতা অঞ্চলের লোকভাষায় যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। যেমন

রাঁধিয়া-বাড়িয়া মেয়েদের মুখে হয়েছে রেঁধে-বেড়ে, খাটিয়া-খুটিয়া লোকমুখে খেটে খুটে ইত্যাদি।[১১] তবে দেবী মুগেশ্বরীর নাম মুগবেড়িয়া লোকসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত একটি তত্ত্ব। এছাড়াও মুগবেড়িয়ার নামকরণের আরও দুটি দিক আমরা বিচার করে দেখতে পারি, যা এই অঞ্চলের জনপ্রবাহের দিকটি তুলে ধরে। পর্তুগিজ জলদস্যুদের অস্থানা যেমন ছিল বায়েন্দা, ঠিক একই রকমে এই অঞ্চল ছিল মগ দস্যুদের ডেরা। ব্রহ্মদেশের এই জলদস্যুরা অঞ্চলিক মানুষদের নিজেদের দাসে পরিণত করে তাদের পায়ে শিখল বা বেড়ি পরিয়ে দিত। তাই মগদের বেড়িয়া (বেষ্টনী) থেকেও মুগবেড়িয়া নামটি আসতে পারে। কারণ এই অঞ্চলের মানুষরা কথ্য ভাষায় দুষ্টা-প্রখরা মেয়েদের 'মাগী' বলে এবং অরাজক পরিস্থিতি বোঝাতে বলে 'মগের মুল্লুক'।[১২] অন্যদিকে এই অঞ্চলেই পাশেই পশ্চিম মেদিনীপুরের মুঘলমারি মুঘল সেনাদের অবাসন ক্ষেত্র ছিল বলে শোনা যায়, যারা বাংলা থেকে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের বিতাড়িত করে বঙ্গে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিল। তারা হয়তো এই অঞ্চলে বসবাস করতো তাই এই অঞ্চলের নাম মুগবেড়িয়া, কারণ এর ঠিক পাশেই বায়েন্দা অঞ্চলে বহু মুসলিমের আবাসস্থল,যা এই অঞ্চলে মুঘল সংস্কৃতির বিস্তারের পরিচয় বহন করে। মুগেশ্বরি দেবীর আবির্ভাব বর্তমান মুগবেড়িয়াতে হলেও এই দেবী কোথা থেকে এলেন বা কারা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা জানা যায়নি। তবে আকৃতি বা গঠন দেখে অনেকে জৈন্যদের দেবী মনে করেন। বর্তমানে দেবীর আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে মনে হয় জঙ্গল পরিষ্কারের আগে হয়তো দেবী নিরাকার পাথরের খন্ড ছিলেন পরবর্তীকালে সাকারে বিশ্বাসী গোঁড়া হিন্দুরা পাথরের আকার প্রদান করে। বর্তমানে গ্রামের ব্রাহ্মনদের নিয়ে সম্পন্ন হয় গ্রামপুজা। জমিদার শ্যামচরণ নন্দ দেবীর পাকা মন্দির নির্মাণ করেন। সমতল ছাদ এবং সরল বা কার্নিশ যুক্ত চাঁদনি মন্দির। চতুষ্কোণ বা আয়তক্ষেত্রাকার পৃথক মণ্ডপ রূপে ত্রিখিলান প্রবেশপথ যুক্ত মন্দিরে মুগেশ্বরী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে অন্নদাচরণ নন্দের শীতলাদেবীও প্রতিষ্ঠিত। ক্ষুদ্রাকার চাঁদনি সংলগ্ন একটি ঢাকা বারান্দা মুখশালার কাজ করে। অন্নদাচরন নন্দ দেবীর নিত্য সেবার জন্য সেবাইত শ্রীপতিচরণ ত্রিপাঠীকে নিযুক্ত করেছিলেন,সেই সঙ্গে ২২ বিঘা জমি দান করেন দেবীর নিত্য পূজার ভার বহন হেতু। বর্তমানে মন্দিরের পূজারী তপন ত্রিপাঠী। যেহেতু জমিদার নন্দ পরিবার দ্বারা এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই দেবীর নামে নন্দ বংশের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সেই কারণে এই দেবী উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেছেন। সর্বসাধারণের মধ্যে সেভাবে প্রচার পাননি। সুতরাং কালুরায় যে অর্থে সর্বসাধারণের দেবতা হয়ে পূজা পাচ্ছেন তাঁকে নিয়ে এই অঞ্চলে যেভাবে অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে, ঠিক সেই অর্থে দেবী মৃগেশ্বরী পূজা পাননি। বা তাঁকে নিয়ে তেমন কোন অলৌকিক কাহিনী গড়ে ওঠেনি যা অবলম্বন করে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে বিশ্বাসবোধ গড়ে ওঠে। তিনি আছেন নিত্য পূজিতা হন এই পর্যন্ত। আজও অনেকে মনে করেন তিনি জমিদার নন্দদের প্রতিষ্ঠিত দেবী।

এখন প্রশ্ন এলাকার লোকমাতা মুগেশ্বরী কে? যিনি মুগবাড়িতে কৃষ্ণশিলা রূপে দেখা দিয়েছেন তিনি উড়িষ্যা থেকে বিস্তীর্ণ কাঁথি-তমলুক-ঘাটাল অঞ্চলে পূজিতা শীতলাই। কারণ দেবী শীতলা মূলতঃ বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী লোকদেবী —যাঁর পূজা প্রচার মুগকলাই দেবীর প্রতিরূপ হিসাবে গণ্য হয়। এই দেবীর পূজা গ্রাম পূজা হিসাবে গণ্য হয় এবং পঞ্চাশ বছর পূর্বে কোথাও দেবীর মানবী মূর্তিতে পূজার চল ছিল না, দারুখণ্ড সংলগ্ন সিঁদুরের তালের উপর রৌপ্য নির্মিত চোখ-মুখ বসিয়ে রক্তাম্বরে সজ্জিতা দেবী, জাগ্রত মঙ্গলদায়িনী রূপে পূজা পান। এছাড়াও কোনো কোনো অঞ্চলে দেবী শীতলা পেতলের ঘটের উপর রূপার চক্ষু চিতা যুক্ত সিন্দুর মাখানো পাথর বা মোম, গালার মুখায় (ভূপতিনগর, জুখিয়া, মানিকজোড়) কিংবা মাটির বা পাকার মাতৃ মূর্তিতে, বাহন গর্দভ ও জ্বরাপাত্র সহ (ডুমরদাঁড়ি, শক্তিয়া, জিয়াখালি, যশীবাড়, লাউদীঘি) কিংবা কাগজে আঁকা পটে (শিমুলিয়া, বিজয়নগর) পূজিত হন। বিভিন্ন এলাকায় নাম বিহীন গ্রামদেবীর পূজাও হয় অন্যান্য দেবীপূজার সঙ্গে। অর্জুননগরে বাসন্তী পূজার সময় মালসা ভরে বলির রক্ত নিবেদন করা হয় নিমতলায় অধিষ্ঠিত গ্রামদেবীর উদ্দেশে। দেবীর রক্ত ভোগ দেখে মনে হয়, ঐ দেবী হয়ত বা ময়নাগড় চিলকীগড় প্রভৃতি স্থানে পূজিতা রঙ্কিনী দেবী বা তাঁর সমগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরাই দেবীর পূজা করেন। তবে দেবীর কাছে নাপিতদের বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় পৌরোহিত্য করেন নাপিতেরাই। বায়েন্দা শ্মশান সংলগ্ন যুগনী পাড়াতেও কালীপূজার পরে বলির রক্ত মাটির মালসাভরে নিবেদন করা হত একসময়। এ নিবেদন যোগিনী ডাকিনীদের উদ্দেশে বলে অনেকে মনে

করেন। এছাড়াও বাসুদেববেড়িয়া ও কুঞ্জপাড়ার গ্রামপ্রান্তে গাছতলায় যোগিনী পূজা হয় রাতে। মনে হয় এর সঙ্গে তন্ত্রাচারের সম্পর্ক আছে। 'সিনি' অন্ত্য-পদ যুক্ত মাচাই সিনি, রূপাসিনি, নেকুড়সেনি প্রভৃতি দেবী পশ্চিম মেদিনীপুরে আদিবাসীদের দ্বারা পূজিতা। অর্জুননগর গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে নেকুড়শুনী এবং বাসুদেববেড়িয়া গ্রামপ্রান্তে পেতাসিনি দেবীর অস্তিত্ব এতদঞ্চলের সঙ্গে আদিবাসী সংস্পর্শের ইঙ্গিত বহন করে। পূর্ব মেদিনীপুরের এই অঞ্চলে বিশেষ ভাবে সিজ গাছে বা পাথরের প্রতীকে সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার পূজা হয়। দেবী সর্ব মঙ্গলাও এই অঞ্চলে বিশেষ ভাবে পূজা পায়। সর্বমঙ্গলা একদা বনদেবী ছিলেন। জেলার প্রাচীন সর্বমঙ্গলা মন্দির গড়বেতায়। মন্দির ১৬শ - ১৭শ শতকের হলেও দেবীর ভীষণ দর্শন দশভূজা মূর্তি আরও প্রাচীন। ভূপতিনগর থানায় একমাত্র সর্বমঙ্গলার থান উত্তরখামারে। চারটি গ্রামে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকা উড়িষ্যা আগত ভট্টাচার্য পরিবারের পূর্বপুরুষ প্রস্তর প্রতীকে দেবীপূজা শুরু করেন কুলদেবী রূপে। সে কারণে মনে হয়, এই দেবীপূজা যথেষ্ট প্রাচীন। দেবীর থানে একই সঙ্গে আছেন শীতলা, দুই মূর্তি রক্ষাকালী, চণ্ডী ও শিবলিঙ্গ। সর্বমঙ্গলার ভগিনী বলে অভিহিত শীতলা ভট্টাচার্যদের এক শরিকের বাড়িতে পটাশপুর থানার ধনকরে অধিষ্ঠিত আছেন।

ভূপতিনগর থানা জনপদে আর এক লৌকিক দেবী হলেন বাসুদেববেড়িয়ার বিখ্যাত অলৌকিক দেবী বিশালাক্ষী। বিশালাক্ষী দেবীর অন্য নাম বাশুলী। পঞ্চদশ শতকের কাব্যে এই দেবীর নাম দেখা যায়। রাজা শোভা সিং-এর বরদা গ্রামের বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির অতি বিখ্যাত। কাঁথি মহকুমার শ্রীরামপুর (পটাশপুর) ও টিকাশী (খেজুরী) প্রভৃতি গ্রামে বাশুলী মন্দির আছে। ভূপতিনগর থানার কাথুরিয়াবাড়ির পাথর প্রতীকে বাশুলী দেবী জীর্ণ মন্দির ছেড়ে এখন বটতলায়। থানার অপর এক বাশুলী বাসুদেববেড়িয়া গ্রামে অবস্থিত। একদিকে শীতলা ও অন্যদিকে চণ্ডীকে নিয়ে মধ্যে দেবী বাশুলী 'বনলক্ষ্মী' নামে বিরাজিতা। 'বনলক্ষ্মী' নাম থেকে সেকালের আরণ্যক জীবনের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাসুদেবপুর রাজাদের দানে দেবীর পুকুর, বাশুলী বাজার ও দেবীর চাঁদনি মন্দির। এখানকার মন্দির পশ্চিমমুখী, যা হিন্দু মতে স্বাভাবিক নয়। এ নিয়ে একটি জনশ্রুতি আছে। পূর্বে মন্দির ছিল পূর্বমুখী। দেবীর মন্দিরে 'শীট' পদবিধারী এক জনপ্রিয় গায়েনের গান হত। উচ্চবর্ণের সমাজপতিরা তাতে বাদ সাধলেন। 'শীট' কে বাদ দিয়ে আনা হল উচ্চবর্ণের এক গায়েন। আসর বসল মন্দিরের সামনে। এদিকে 'শীট'- গায়েন অযাচিত ভাবে এসে মাকে শোনাতে গান ধরলেন মন্দিরের পেছনে। রাতে স্বপ্নাদেশ পেলেন পুরোহিত, ভক্তির টানে তিনি পশ্চিমে মুখ ফিরিয়েছেন এবং এভাবেই থাকবেন। এটি জনশ্রুতি, তবে সর্বাংশে অমূলক নাও হতে পারে।

এই অঞ্চলের আরও এক লোক দেবতা হল, বনদেবতা - কালুরায়, গোষ্ঠ - গোবিন্দ রায়। নদীবিধৌত অরণ্যময় অঞ্চলের কৌম অধিবাসীরা বাঘ - কুমির প্রভৃতির আক্রমণ থেকে নিজেদের এবং গোসম্পদকে রক্ষা করতে নানা নামের দেবতার উদ্দেশে পূজা দিয়েছে। সুন্দরবনে যেমন দক্ষিণরায়, মেদিনীপুরে তেমনি কালুরায়। শ্রী বল্লভ ও দ্বিজ নিত্যানন্দ রচিত কালুরায়ের গীত মূলত মেদিনীপুরের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রচারিত। ভূপতিনগর থানার অনেক গ্রামের গাছ তলায় এখনো দু'তিনটি পাথর প্রতীকে কালুরায় পূজিত হন গ্রামপূজার সঙ্গে। সেই সঙ্গে হয় গোষ্ঠপূজা। হরিপুর গ্রামের কালুরায়ের জন্য নির্মিত হয়েছে পাকা চাঁদনি। ইটাবেড়িয়া - উদবাদাল খালের সঙ্গমে হাবলি গাছের তলায় গোবিন্দরায় পূজিত হন। গোবিন্দপুরের মোহনার ঘূর্ণিতে পূর্বে বহু নৌকা তলিয়ে গেছে। সম্ভবত গোবিন্দরায় নদী পরিবহনের মঙ্গলময় দেবতা হিসেবেই পূজিত হন। জনপ্রিয়তা ক্রমশই বাড়ছে। প্রতিদিনই ভক্তরা আসেন ক্ষীরভোগ পূজা নিয়ে। পঞ্চাশটি উনুন তৈরি আছে ক্ষীরভোগ রান্নার জন্য। অক্ষয় তৃতীয়ায় তিনশো থেকে চারশো পর্যন্ত পূজা আসে, বললেন স্থানীয় দোকানদারেরা।[১৩]

জ্বরের দেবতা জ্বরাসুর মেদিনীপুরের কোথাও কোথাও আলাদা পূজিত হন। এতদঞ্চলে জ্বরাপাত্র নামে একই মন্দিরে থেকে শীতলার সঙ্গে পূজা পান তিনি। এছাড়াও এই ভূপতিনগর জনপদে চণ্ডী, ভীম ঠাকুর, রামজিউ, পঞ্চানন বা পাঁচু ঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজা হয়, যা একক ভাবে শুধু এই অঞ্চলের সংস্কৃতি নয়, বরং বহু জনপ্রবাহের সাংস্কৃতিক বিনির্মাণের ফল।

Reference :

১. চৌধুরী, কিরণচন্দ্র, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস কথা, ১৯৮৭, পৃ. ১৪

২. করণ, মহেন্দ্রনাথ, রচনা সংকলন, ২০০২, পৃ. ১৮৭ - ১৫১

৩. করণ, মহেন্দ্রনাথ, রচনা সংকলন, ২০০২, পৃ. ৮১

৪. দাস, মন্মথনাথ, ভগবানপুর ও ভূপতিনগর থানার ইতিহাস, কলকাতা, দে পাবলিকেশন, ২০২০, পৃ. ৫৮

৫. ভট্টাচার্য, শম্ভু, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির, কলকাতা, মনন প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৫৮

৬. সান্যাল, নারায়ণ, কারুতীর্থ কলিঙ্গ, কলকাতা, ভারতী বুক স্টল, ২০১৬, পৃ. ২৯

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ, ভারতের ইতিহাস সন্ধানে (দ্বিতীয় খন্ড) কলকাতা, সাহিত্যলোক, ২০১৭, পৃ. ৫২৮

৮. জানা, যোগেশ চন্দ্র, এক ঘুমন্ত নগরীর রূপকথা, মুগবেড়িয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র (উৎসব সংখ্যা), ১৪২৫, পৃ. ৪৭ – ৪৯

৯. দ্রষ্টব্য ৪ নং পৃ. ৮২

১০. তদেব পৃ. ২১

১১. নায়েক, রণজিৎ কুমার, মুগবেড়িয়া জনপদের সংস্কৃতি চর্চা, মুগবেড়িয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র (উৎসব সংখ্যা), ১৪২৫, পৃ. ২১

১২. দ্রষ্টব্য ৮ নং পৃ. ৪৭ – ৪৯

১৩. দ্রষ্টব্য ৪ নং পৃ. ৯৪ - ১০৩